যুগান্তর
12 APR 2008

তারেক শামসুর রেহমান

বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উপাচার্য নিয়োগ!

শিক্ষা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ এখন উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পূরণ করা হবে বলে সার্চ কমিটি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ২০ মার্চ সার্চ কমিটির এক সভায় এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে পত্রপত্রিকা থেকে আমরা জানতে পেরেছি। ওই সার্চ কমিটির সভায় শিক্ষা উপদেষ্টাও উপস্থিত ছিলেন। সার্চ কমিটির সভার পর শিক্ষা উপদেষ্টা মহোদয় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উপাচার্য নিয়োগের পক্ষে যুক্তিও তুলে ধরেছেন। আমি শিক্ষা উপদেষ্টা মহোদয়কে দোষ দিই না। তিনি কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কিভাবে চলে, তা তার জানার কথাও নয়। তিনি ও সার্চ কমিটির সদস্যরা ধরে নিয়েছেন হাজারটা চাকরির মতো একজন অধ্যাপকও উপাচার্য পদের জন্য আবেদন করবেন। চাই কি সার্চ কমিটি তার সাক্ষাৎকারও নেবে। যিনি জীবনের দীর্ঘ সময় পার করে এক সময় প্রভাষক থেকে অধ্যাপক হয়েছেন, তিনি আজ পরিণত বয়সে এসে শুধু উপাচার্য হওয়ার জন্য আবেদন করবেন! উপাচার্য পদটি কি কোন চাকরি? যে কারণে একজন শিক্ষককে (নাকি একজন আমলাকে) সাক্ষাৎকার দিয়ে উপাচার্যের চাকরি নিতে হবে? একজন সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক কি তা করবেন? আমার ভাবতে অবাক লাগে, সার্চ কমিটির ওই সভায় চারজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সার্চ কমিটির সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যার মাঝে ছিলেন দু'জন সাবেক উপাচার্য— তারা কি করে এ সিদ্ধান্তটি অনুমোদন করলেন? ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের মতো একজন সিনিয়র শিক্ষক, যিনি ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি কি কোনদিন আবেদন করে উপাচার্য হবেন? কিংবা ড. নুরউদ্দীন আহমদ কিংবা ড. এহসানুল হক, যারা উপাচার্য ছিলেন— তারা কি আবেদন করে উপাচার্য হতেন? আমার মনে হয় না। শিক্ষা উপদেষ্টা মহোদয় বিদেশী কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। যুক্তি হিসেবে সেটা ঠিক আছে। কিন্তু বাংলাদেশ, ব্রিটেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্র এক নয়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতির সঙ্গে ব্রিটেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতিকে এক সঙ্গে মেলানো যাবে না। এখানকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য হিসেবে যারা দায়িত্ব নেন, তারা শুধু একেকজন একাডেমিশিয়ানই নন, বরং একেকজন দক্ষ প্রশাসকও বটে। তাকে 'ক্ষমতার বিভিন্ন বলয়ের' সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে যিনি নিয়োগ পাবেন, তিনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্রটি বুঝতে না পারেন (যা তার না বোঝারই কথা), যদি তিনি 'ক্ষমতার বিভিন্ন বলয়'-এর সঙ্গে সমন্বয় করে চলতে না পারেন, তাহলে তিনি ভিসি হিসেবে এক মাসও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবেন না। তাকে একসময় অপদস্ত হয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। আশংকা হচ্ছে, এ ধরনের 'ফর্মুলা'(?) কি দাতাগোষ্ঠী আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে? একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি মনে করি, 'বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উপাচার্য নিয়োগ'-এর সিদ্ধান্ত শিক্ষকদের মানসম্মান ও ...পোর প্রতি অবমাননাকর। আমি মনে করি, এ দেশে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক রয়েছেন— যারা করবেন না। আমি অন্তত কোনদিন করব না। কিন্তু আমি চাই এসব উজ্জ্বল ব্যক্তিদের রাষ্ট্র সম্মানিত করুক। সার্চ কমিটি তাদের খুঁজে বের করে নিয়োগ দিতে পারে। এর জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই।

আসলে মূল জায়গাটি আমাদের দেখতে হবে। কারা উপাচার্য হন? কিভাবে তারা উপাচার্য হয়েছেন? উপাচার্য হওয়ার পর গত পাঁচ বছরে তারা কি করেছেন? সংবাদপত্রকে বর্তমান সরকার চিহ্নিত করেছে এক ধরনের 'পার্লামেন্ট' হিসেবে। এই 'পার্লামেন্টের' দিকে চোখ বুলান, বিগত জোট সরকারের আমলে ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা নিয়োগ পেয়েছিলেন, তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে ওই 'পার্লামেন্টে' কি লেখা হয়েছিল? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে তো সব 'তথ্যই' আছে। তা দয়া করে প্রকাশ করুন। আসলে বিষয়টি হচ্ছে 'রাজনীতিকরণ'। আমরা আমলাদেরও যেভাবে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলাম, ঠিক একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও রাজনীতি ঢুকিয়ে দিয়েছি। চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন বহাল রয়েছে। কিন্তু এখানেও ভয়াবহ রাজনীতি হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগে এখন 'রাজনীতি' প্রাধান্য পাচ্ছে। কর্মচারী নিয়োগে রাজনীতি হচ্ছে। ছাত্র ভর্তিতে রাজনীতি হচ্ছে। রাজনীতির পাশাপাশি এসেছে আঞ্চলিকতা। বিশেষ এলাকার লোকজন প্রাধান্য পাচ্ছেন। এসব তো শিক্ষা সচিবের অজানা নয়। যিনি কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াননি, তিনি সরাসরি 'অধ্যাপক' পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়েছিলেন জোট সরকারের আমলে— তাও ওই 'রাজনীতির' কারণে। আমি একাধিক দৃষ্টান্ত দিতে পারব, যেখানে চারটি প্রথম শ্রেণী পেয়েও শিক্ষক হতে পারেননি, কিন্তু কোন প্রথম শ্রেণী না পেয়ে কিংবা মাত্র তিনটি প্রথম শ্রেণী পেয়ে শিক্ষক হয়েছেন। পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েও শিক্ষক হতে পারেননি— কেননা তিনি বিশেষ 'ঘরানার' লোক নন। নজরুলের ওপর গবেষণা করেও নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হতে পারেননি— এ দৃষ্টান্তও আমি দিতে পারব। আর উপাচার্য? কারা অতীতে উপাচার্য হয়েছেন, কিভাবে হয়েছেন— এটা কোন গোপন খবর নয়। সার্চ কমিটির সদস্যরা তা জানেন না, তা নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'রাজনীতিকরণ' বন্ধ করুন— তাহলে ভালো উপাচার্য পাওয়া যাবে। উপাচার্যের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়ার প্রয়োজন হবে না। এটা কিভাবে সম্ভব?

সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেছিল। মঞ্জুরি কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রথম থেকে জড়িত না থাকলেও, তার নেতৃত্বেই খসড়া আইনটি প্রস্তাব আকারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। আমি শিক্ষা উপদেষ্টাকে অনুরোধ করব ওই আইনটি পড়ার। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ওই আইনটি যদি বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনীতি অনেক কমে আসবে এবং অনেক গুণী ব্যক্তি তখন রাজি হবেন উপাচার্য হতে, যারা এখন হচ্ছেন না ওই 'রাজনীতি'র ভয়ে। যে দেশে একজনকে উপাচার্য হতে তার মেধা ও যোগ্যতার চেয়ে দুটি বড় রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের ওপর নির্ভর করতে হয়, সে দেশে কোন গুণী শিক্ষাবিদ কোনদিন উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসবেন না। প্রস্তাবিত আইনটি উপদেষ্টা পরিষদে জরুরি ভিত্তিতে উত্থাপন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। নির্বাচনের পর দেশে একটি রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আমার ভয়, ওই 'রাজনৈতিক সরকার'ও এই আইনটি পাস করবে না। কেননা তারাও চাইবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকুক। ফলে 'রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব', যারা শিক্ষক, তারাই উপাচার্য হবেন এবং সেই আগের ধারাতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলবে। সুতরাং এখনই সময়। পরিবর্তনটা আনতে হবে এখনই। আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি নিয়ে সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টার সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি সভা হয়েছিল। ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রস্তাবিত আইনটির ব্যাপারে মতামত দেবে। সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল দু'মাস। সেই দু'মাস শেষ হয়ে গেছে ছ'মাস আগেই। কিন্তু অগ্রগতি কি? শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা ইউজিসি কি এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিয়েছে? সর্ষের মধ্যে যদি 'ভূত' থাকে, তাহলে তো আমরা 'ভূত' তাড়াতে পারব না? ওই আইনটির ব্যাপারে সাধারণ শিক্ষকদের প্রশ্ন থাকতে পারে, তাদের আপত্তি থাকতে পারে— এটা অস্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক। আমরা তাদের কথা শুনতে চাই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গুটিকয়েক শিক্ষক নেতা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা বড় অংশই শিক্ষক রাজনীতি'র বিপক্ষে। তারা চান না বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষকতার পাশাপাশি একই সঙ্গে জাতীয় রাজনীতিতেও অংশ নিক। একজন শিক্ষককে একটি পদ

রাজনীতি। শিক্ষকরা অনেক মেধাসম্প
তারা জাতিকে অনেক কিছু দিতে পারে
তারা যদি জাতীয় রাজনীতিতে আসেন, তাহ
'জাতীয় রাজনীতির চেহারাটাই বদলে যাে
নিদেনপক্ষে তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছ
নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে আসতে পারে
এটা না করে তারা যদি শিক্ষকতার পাশাপা
জাতীয় রাজনীতিতেও অংশ নেন, তাহলে
বড় ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। আ
একাধিক শিক্ষক নেতাকে চিনি ও জানি, যা
কোন বড় দলের উপদেষ্টা, কেউ আবার কে
দলের গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডিয়াম সদস্য। উপদে
হিসেবে কিংবা প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসে
তিনি প্রকাশ্যেই জাতীয় রাজনীতিতে অ
দিচ্ছেন। একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি য
তার দলীয় সিদ্ধান্ত তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠা
বাস্তবায়ন করতে যান, তখন সেখানে
স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে বাধ্য। তার শি
প্রতিষ্ঠানে তার রাজনৈতিক মতামতের প্র
সবাই শ্রদ্ধাশীল থাকবেন— এটা তিনি আ
করতে পারেন না। এ জন্যই আমি মনে ক
শিক্ষকদের জাতীয় রাজনীতিতে জড়িত থা
উচিত নয়। তবে একজন শিক্ষক তো জাতি
বিবেক। তিনি দেশের রাজনীতি, অর্থনী
সমাজনীতি কিংবা জাতীয় ইস্যুতে ত
মতামত দিতেই পারেন। একই সঙ্গে আমি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথাকথিত ছাত্ররাজনীতির
বিরুদ্ধে। বর্তমানে যে ধারায় ছাত্ররাজনী
পরিচালিত হচ্ছে, তাতে করে অছাত্রর
লাভবান হচ্ছে। একটি সুবিধাভোগী শ্রে
তথাকথিত ছাত্ররাজনীতির নামে ক্যাম্পাসগু
'দখল' করে রাখছে মাত্র। ছাত্ররা রাজনৈতি
সচেতন হবে— এটা স্বাভাবিক। কি
ক্যাম্পাসকে 'জিম্মি' করে নয়। ছাত্রসমাজে
স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তারা যদি সংগঠিত হয়,
সমর্থনযোগ্য। দুঃখটা এখানেই। ছাত্ররাজনী
এখন বেশি মাত্রায় জাতীয় রাজনীতি দ্বা
প্রভাবিত। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় আই
শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পাশাপা
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালনা পরিষ
(সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ডি
নির্বাচন ইত্যাদি) ব্যাপক পরিবর্তনের প্রস্ত
করা হয়েছে। আমি অনুরোধ রাখব, শি
উপদেষ্টাকে প্রস্তাবিত আইনটি দেখার
প্রয়োজনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত আইন
নিয়ে শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে খোলামে
আলোচনা করতে পারে। কিছু বি
পরিবর্তনও করা যেতে পারে। প্রস্তাবি
খসড়াটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'ওয়েবসাইটে
দিলেও মতামত পাওয়া যাবে। পত্রিক
বিজ্ঞাপন দিয়ে উপাচার্য খোঁজার প্রক্রি
বিতর্কিত হতে বাধ্য। বিবেক বিবর্জি
শিক্ষকরাই এই প্রক্রিয়া সমর্থন করবেন। য
ন্যূনতম আত্মসম্মানবোধ আছে, তিনি আবে
করে উপাচার্য হবেন— এটা আমি বিশ্বাস ক
না। আরও একটি সম্ভাবনা আমি দেখছি
হচ্ছে, ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা। স
কমিটির কর্তাব্যক্তিদের 'ব্যক্তিগত পছ
উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পা
করতে পারে। সেক্ষেত্রে তার যোগ্যতা
মেধা গৌণ হয়ে যেতে পারে। আমি দুঃখি
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তটি আমি সমর
করতে পারলাম না। উপাচার্য পদটি অত্য
সম্মানের এটা কোন চাকরি নয়। সিনিয়
শিক্ষকরা, যারা আমাদের নমস্য, তারা যখ
এ ধরনের একটি সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থ
জানান (সার্চ কমিটিতে থেকে), তখন স
সত্যি, আমাদের ভরসার সর্বশেষ জায়গাটি
হারিয়ে যায়।

ড. তারেক শামসুর রেহমান : অধ্যাপক